ধূসর গোধূলি

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Dhushor Godhuli by **Atika Begum Rashi**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970

e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 200.00
US $ 10

ISBN 978 984 95365 3 6

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আমার সব লেখা বইয়ের আকার পেতে নেপথ্যে যার সহযোগিতা
থাকে সে আমার ছোটো ভাই **মনিরুল ইসলাম সিজার**।
'ধূসর গোধূলি' উপন্যাসটি তাকেই নিবেদন করলাম।

—আতিকা বেগম রাশি
রাজবাড়ী

ভূমিকা

উপন্যাস লিখতে গিয়ে সকল ঔপন্যাসিকই নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে থেকে গল্পের শুরু এবং শেষ করেন। এর মধ্যে হরেক মেজাজের ধারা উপধারার সৃষ্টি হয়ে কাহিনির বিন্যাস হয়। আমার এই উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। চিরায়ত চিন্ড়র প্রতিফলন ঘটিয়ে এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে চেষ্টা করেছি একটা উপাখ্যান দাঁড় করানোর। উপন্যাস লিখতে গিয়ে যতটা-না বেগ পেতে হয়েছে ভূমিকা লিখতে তার কয়েকগুণ বেশি বেগ পেতে হচ্ছে। কেননা কাহিনিটা জীবনঘনিষ্ঠ। নিত্যদিন আমরা যে জীবন দেখি, যে জীবনের সাথে সময়ের ব্যবধানে গড্ডলিকা প্রবাহের মতো ভেসে যাই তাই কি জীবন? যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় জীবন কী? উত্তর দিতে হাজারবার আমাকে থামতে হবে। কেননা শুধু বেঁচে থাকার নাম জীবন নয় বা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ড় সময়টুকুর নামই জীবন নয়। আসলে পরিপূর্ণ জীবনের কোনো সংজ্ঞা হয় না।

আমরা সবাই নিশ্চিন্ড় হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চাই। কিন্তু জীবন নানান স্রোতে বহমান। কেউ কেউ সুখের কূলে নোঙর ফেলতে সমর্থ হই আবার কেউবা দুঃখের কূলে খড়কুটোর মতো খাবি খেতে থাকি। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সায়মার জীবনটা বিধ্বংসী ঝড়ে বিধ্বস্ড় হয়েও এক সময় কূলের দেখা পায়। পরিবার থেকে সাহস ও প্রেরণা জোগান বাবা-মা। ভাগ্যের জোরে সুমন নামের এক অবাক চরিত্র পাশে এসে দাঁড়ায়। শুধু ভালোবাসাই নয় সায়মার ভালোমন্দ সবকিছুই সে ভাগ করে নেয়। স্বপ্নপূরণের পথে সায়মার এক অনুবদ্ধ সারথি। জীবন চলার পথে নানান ঘাতপ্রতিঘাতকে সে তার অস্বাভাবিক মানবিক মূল্যবোধ ও ভালোবাসার অত্যুজ্জ্বল শক্তি দিয়ে সায়মাকে রক্ষা করে। কিন্তু সকল পূর্ণতা একসাথে আসে না। আর

সেই অপূর্ণতা ধুঁকে ধুঁকে জীবনের অর্থ শেখায়।

সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে চারপাশে আমরা শুধু স্বার্থপরতা দেখি। এত স্বার্থপরতার মাঝেও সুমন নামের চরিত্রগুলো ঘুণেধরা সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হতে পারে। উপন্যাসটিতে হরেক চরিত্রের ব্যতিক্রম উপস্থাপন কাহিনিকে প্রাণবন্ড় করে তুলেছে। চলমান সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়কেও চেষ্টা করেছি সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য। উপন্যাসের পরতে পরতে মানবিক মূল্যবোধের সৌন্দর্যকে প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব দেওয়ার মানসে সুমন চরিত্রটিকে প্রজন্মের কাছে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছি যেন সমাজ বিনির্মাণে এরা ভিন্নতর আলোর দিশারি হতে পারে। উপন্যাসটি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই আমার শ্রমটুকু সার্থক এবং আত্মিক চাওয়ার বীজ রোপিত হবে। ধন্যবাদ।

আতিকা বেগম রাশি
রাজবাড়ী

গাড়ি চলছে পরিচিত সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে। দুই পাশের ঝোপঝাড় পার হয়ে, দিগন্ড়জোড়া ফসলি মাঠ পেরিয়ে সামনের দিকে। সর“ রাস্ড়া এঁকেবেঁকে সাপের মতো বিছিয়ে আছে যেন। তারই আকারে লক্কড়ঝক্কড় বাসটিও এঁকেবেঁকে চলছে। কোথাও সমতল, কোথাও বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ার আকুল প্রত্যাশায় গাড়িটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যেন। এখন আটজন যাত্রী রয়েছে মাত্র। ছয়জন পুর“ষ দুইজন নারী। সবাই আধঘুমে নিমগ্ন। মাঝে মাঝে কন্ট্রাক্টরের চিৎকার, বাসের ভেঁপু শব্দে যাত্রীদের ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে বারবার। শহর থেকে বহুদিন পর জমিলা খাতুন তার ষোড়শী মেয়ে সায়মাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে। বিশ বছর পরে তাদের এই যাওয়া সেটাও ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে। বিশ বছর আগে বিয়ের পরে জমিলা খাতুন তার গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন শহরে। বিভিন্ন ঝামেলা, সন্ড়ানের লেখাপড়া, স্বামীর অসুবিধা হবে ভেবে আর আসা হয়নি। খোঁজখবর নিয়েছে মাঝেমধ্যে। বাবা-মা তার বিয়ের আগেই হারিয়ে গেছেন। দুই ভাই তাদের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছেন বোনের বিয়ে দিতে। সাহেব আলির কেউ নেই। তিনি একা। বিশ বছর আগে জমিলা খাতুনের সাথে তার বিয়ে হয়। সাহেব আলির দিনে দিনে চাকুরির প্রসারতা বেড়েছে। সংসারে সায়মা এক সন্ড়ান। জন্মের পর সে গ্রাম দেখেনি, মাতৃকুলের মামা-মামিদের ছাড়া কাউকে তেমন জানে না। যা জেনেছে সেটা মায়ের মুখে। জমিলা খাতুনের বিয়ের পর নিজ মেয়েকে নিয়ে তার এই প্রথম যাওয়া। তারা এই বাসের যাত্রী। শহর থেকে দুশো কিলোমিটার দূর হবে। প্রথমে ট্রেন, তারপর ফেরি পার হয়ে এই বাসে

ওঠা। গন্তব্যস্থল রায়পুর। বর্তমান যুগে আলো ঝলমলে শহরে বাস করা মানুষ যখন অজ পাড়াগাঁয়ে ঘুরতে আসে তখন সেটা নতুন নতুন লাগে। নতুন অনুভূতিতে পুলকিত হয়ে ওঠে। যা দেখে সেটাই ভালো লাগে। শহরের সব ব্যস্ততা পার হয়ে সবুজ শ্যামল পরিবেশ, মুক্ত শান্ত বাতাসে শরীর মন দুটোই জুড়িয়ে দেয়। এখানে কোনো ধুলোবালি নেই, নেই গাড়িঘোড়ার বিকট শব্দ। নেই কোলাহল, নেই শব্দ। শান্ত নিবিড় পরিবেশ দেহমনকে দেয় অপার শান্তি। শহরের কোলাহলমুক্ত পরিবেশ হতে নিস্তব্ধ পেতে গ্রামের মুক্ত পরিবেশই হতে পারে যথার্থ। জমিলা খাতুন প্রায় দুই যুগ তার নিজের জন্মস্থান থেকে দূরে ছিলেন। ভাবতেই দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। সেই ছেলেবেলা, সেই দুরন্ত শৈশব, সেই পরমপ্রিয় বাবা-মা কোথায় চলে গেল? অশ্রুসিক্ত হয় হৃদয়, মন! সায়মার শিশুকাল কেটেছে বাবা-মায়ের আদর ভালোবাসায়। শহরের ব্যস্ততায় আর ঘরের মধ্যে। কদাচিৎ বাবা তাকে নিয়ে বের হতেন কোনো পার্কে অথবা কোনো অনুষ্ঠানে। তারপর শুরু হয় লেখাপড়া। মা তাকে নিয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করতেন। প্রাথমিক পর্ব পার হয়ে মাধ্যমিকে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাকে আরও সংযত হয়ে চলাচল করতে হতো। মা মাঝেমধ্যে যেতেন, বাবাও যেতেন আবার বন্ধুদের সাথেও যাওয়া-আসা চলত। একটা নামকরা স্কুলে সে পড়ে। ভালো রেজাল্ট সে করেছে বরাবরের মতো। এবারে সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এবারও আশা করছে সবাই, তার রেজাল্ট খুব ভালো হবে। এই ফাঁকে এই বিয়ের নিমন্ত্রণ। বাবা তাকে অতি উৎসাহে তাদের মামাতো বোনের বিয়েতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। সায়মা তার মায়ের রূপের ভাগ পেয়েছে। রূপে গুণে সরস্বতী। তাই সব সময় বাবা-মাকে সতর্ক থাকতে হয়। কখন না জানি কোন কুদৃষ্টি পড়ে সায়মার ওপরে। যদিও বাস যাত্রা খুব বেশি সুখপ্রদ নয় তবুও তার খুব ভালো লাগছে। জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করছে। জন্মের পর ও কখনো গ্রাম দেখেনি। এখানে শহরের ধুলাবালি, যানজট, ছিনতাই, মারামারি, কাটাকাটি বোধহয় হবে না। হঠাৎ করে বাস থেমে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করে জানল চাকা লিক হয়েছে, নতুন চাকা লাগাতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জমিলা খাতুনের আর ভালো লাগছে না। নিজের মনেই ভাবছে কখন যে পৌঁছাবে? চাকা লাগানো হলে বাস আবার চলতে শুরু করল। গন্তব্যে পৌঁছাতে আরও আধাঘণ্টা লাগবে। ড্রাইভার আর কর্মচারী দুজন। সায়মা লক্ষ করেছে ড্রাইভার আর কর্মচারীরা ফাঁকফোকরে তার দিকে তাকাচ্ছে। সায়মা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবছে, এই শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে ভদ্র আচরণ পাওয়া কষ্টকর। এদের শিক্ষা নেই, নিম্ন পরিবার থেকে উঠে আসা বিপজ্জনক লোক। গন্তব্যস্থল এসে গেছে। জমিলা খাতুন মেয়েকে নিয়ে নামলেন। তার ভাই বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছে। মামাকে দেখে সায়মার চিন্ত খুশির আলোতে জ্বলে উঠল। তারা ভ্যানে চড়ে মামাবাড়িতে প্রবেশ করল। আগামী পরশু মামাতো বোন নাদিরার বিয়ে। আত্মীয়স্বজনের ভিড়। ওদের দেখে সবাই দৌড়ে এলো, বুকে জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে। এতদিন পর জমিলা খাতুন নিজ বাড়িতে আসতে পেরে আনন্দে কেঁদে উঠলেন। সে এক আনন্দঘন মুহূর্ত।

সকাল হলো। সায়মা নাদিরাকে পেয়ে খুব খুশি। বিয়েবাড়ির কোলাহল, আত্মীয়স্বজনের ভিড়, পাড়াপ্রতিবেশীদের আনাগোনা বিয়েবাড়িকে আরও আনন্দমুখর করে তুলল। সবকিছু ছাপিয়ে সায়মাকে দেখার আগ্রহও কম নেই কারো। দীর্ঘদিন পর জমিলা খাতুনকে পেয়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা খুব খুশি। সায়মা চারপাশটা ঘুরে দেখবার প্রত্যাশায় নাদিরাকে বলল, তাকে নিয়ে যেতে। বাড়িটা পদ্মা নদীর তীরে। ওদের বাড়ি থেকে আধা কিলোমিটারের কম হবে। রিকশা বা ভ্যানে ছয়/সাত মিনিট লাগে। নাদিরা বলল বিকালে যতটা পারে ঘুরে দেখাবে। বিশেষ করে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা। এখন বিয়েতে ঘর সাজানোর দায়িত্ব পড়েছে সায়মার ওপরে। সে তার মামাতো ভাইবোনদের সাথে এবং নাদিরার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবীদের সাথে বরের আসনটি সাজানোর জন্য প্রস্তুত হলো। বিয়েবাড়ির হইচইয়ের মাঝে সায়মার আপাতত গ্রামটি ঘুরে দেখবার নেশাটা বন্ধ হলো। তারা সবাই নাদিরাকে খনে খনে ঠাট্টা আর হাসির মধ্যে ভরে

তুলল। চলছে বিরামহীন খাওয়াদাওয়া। বাচ্চাদের কলরব সবকিছুর উর্ধ্বে। মহিলারা বসে বরের জন্য সাগরানা তৈরি করছে। গ্রামের কিছু মহিলারা বিয়ের গীত গাইছে। তাদের সামনে পানের ডিব্বা। ডেকোরেশনের লোকেরা শামিয়ানা টানাতে ব্যস্ড়। পুর"ষলোকেরা সেগুলোর তদারকি করছে। বাবুর্চিরা তাদের ডেকচি পাতিল ঠিকঠাক করছে। কোথায় রান্না হবে, একসাথে কতজন লোক বসতে পারবে সে জায়গাও নির্ধারণ করছে। এমনি ব্যস্ড়তায় সময় অতিক্রান্ড় হলো। সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিয়েবাড়ির ব্যস্ড়তার মধ্যেই সায়মাকে নিয়ে নাদিরা সবার অলক্ষে বেরিয়ে পড়ল নদীতীরের সৌন্দর্য দেখাবার জন্য। ষোলো বছরের জীবনটা মুহূর্তেই প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সামনে বিশাল জলরাশি, ওপরে রক্তিম উদার আকাশ সায়মার মনকে ভরিয়ে দিলো পরম অনুভূতিতে। নদীতীরের সৌন্দর্য যে এতটা মুগ্ধতায় ভরা, সায়মা কোনোদিন জানতেই পারেনি। এমন সৌন্দর্য, এমন মোহনীয় নিসর্গ রূপ কখনো দেখেনি সে। গোধূলি রঙে রাঙা অস্ড়গয়মান লাল সূর্য। চারপাশের নীরব পরিবেশ দেখে মন ভরে যায় অন্যরকম এক প্রশান্ড়িতে। এক নৈসর্গিক নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পরিবেশ। এই শোভা, এই মনোহর পরিবেশ দেখে মনের তৃষ্ণা আর মেটে না। ঘনায়মান সন্ধ্যার অপরূপ রূপের মাধুর্য সায়মা ধরে রাখল হৃদয়ে। রক্তিম আকাশ আর বিশাল নদীর প্রেক্ষাপটে সূর্যাস্ড়ের বিচিত্র শোভা মনের পর্দায় চিরকাল আঁকা থাকল। কতক্ষণ কেটে গেছে সায়মার তা খেয়াল নেই। নাদিরার ডাকে তার জাগ্রত স্বপ্নের ইতি ঘটল। এখন ফিরতে হবে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তারা দুজনই ঘরে ফেরার জন্য দ্র"ত পা বাড়াল। ফেরার পথে কিছু ছেলেদের দেখতে পেল। তারা লোভাতুর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। নাদিরা সায়মার হাত ধরে এগিয়ে গেল। কিছু কুর"চিসম্পন্ন কথা কানে এলো। সায়মা পেছন ফিরে দেখতে লাগল কারা এগুলো বলছে। কিন্তু নাদিরা সেগুলোতে মনোযোগ না দিয়ে সায়মাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। অনেকক্ষণ ওদেরকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির লোকেরা চিন্তা করছিল। ওরা ফিরলে বড়োরা মৃদু শাসন করলেন। সায়মা এগুলো খেয়াল না করে

মনে মনে নদীতীরের দৃশ্যের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করল। বাড়ির লোকেরা ব্যতিব্যস্ড় হয়ে উঠেছে। রাত পোহালেই বিয়ের অনুষ্ঠান। বাবুর্চিরা খাবারের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ড়। খাসি, মুরগি কাটাকাটি করছে। কেউ কেউ মসলা বাটছে। রাত পোহানোর সাথে সাথেই রান্না শুর" করবে। তাদের ঘুম নেই চোখে। বরযাত্রী একশতজন আসবে। নিমন্ত্রিত অতিথি এক হাজার। বড়োরা সেভাবেই নির্দেশনা দিচ্ছে। আত্মীয়স্বজন তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসে গেছে প্রায়। রাতের খাবার বাবুর্চিরাই তৈরি করেছে। এতলোকের খাবার নিজেদের প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। ছেলেমেয়েরা ছোটো করে একটা হলুদের অনুষ্ঠান করল। নাদিরাকে হলুদ শাড়িতে অপূর্ব লাগছে। সুন্দর করে সাজিয়ে ওকে স্টেজে, ফুলের সাজে বসিয়ে সবাই নাদিরাকে হলুদ ছোঁয়াল। ছবি তোলার সাথে সাথে নাচ গানও হলো। সবাই দক্ষ এবং অদক্ষতার সাথে নাচ দেখাল। হলুদ অনুষ্ঠানে বাড়ির সবাই একসাথে জমায়েত হয়ে আনন্দোল্লাসে ব্যস্ড় হয়ে পড়ল। এক সময় সেই অনুষ্ঠানও শেষ হলো। রাতের খাবার খাওয়া হলে অনেকেই শামিয়ানার নিচেই ঘুমিয়ে পড়ল। সায়মা আর নাদিরাও শুয়ে পড়ল। কাল অনেক ব্যস্ড়তা, অনেক ঝামেলা আছে। নাদিরা কাল থেকে এক নতুন জীবনে পা রাখবে। কিছুটা আনন্দ, কিছুটা কষ্ট তার মনটাকে জড়িয়ে আছে। কেমন হবে শ্বশুরবাড়ি, কেমন হবে তার বর এসব চিন্ড়া করতে করতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল সায়মা তা জানতে পারল না। আর সায়মার মনজুড়ে আছে পদ্মার তীর আর সূর্যাস্ড়ের মাঝে। আবার কখন সে যাবে, কখন সে দৃশ্য দেখে মন ভরাবে সেই চিন্ড়া করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময় বাড়িটি নির্জন নীরবতায় হারিয়ে গেল। শুধু জেগে রইল কয়েকজন বয়স্ক মানুষ। তারা চা পান করছে আর অতীতের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে।

সায়মা আর নাদিরা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এরই মাঝে ডেকচি পাতিলের নানাবিধ শব্দ ভেসে আসছে। বাড়িতে কোলাহল শুর" হয়ে গেছে। পুরো বাড়িটা জেগে উঠেছে যেন। বাইরে নাশতা খিচুড়ি খাওয়ার জন্য সবাই তাগিদ দিচ্ছে। কেউ কেউ রান্নার প্রশংসা করছে। জমিলা খাতুন নাদিরাকে হলুদের গোসল করার তাগিদ দিয়ে গেল। কেউ একজন দুজনের জন্য খিচুড়ি দিয়ে গেল। সাথে দুটো ডিম ভাজা। এই ব্যবস্থা বাকিদের জন্য না হলেও ওদের জন্য হয়েছে। দুবোন সকালের প্রাসঙ্গিক কাজগুলো সেরে খেতে বসল। ওরাও খিচুড়ির প্রশংসা করল। খাওয়া শেষ করতেই নাদিরার মা এসে বললেন, গ্রামের রীতি অনুযায়ী মহিলারা নাদিরাকে গোসল করাতে আসবেন। দশটার মাঝেই প্রতিবেশী মহিলারা ক্ষীর পায়েস নিয়ে গোসল করাতে আসলেন। সায়মা শহরে বহু বিয়ে দেখেছে কিন্তু এমন গোসল করানো কখনো দেখেনি। নাদিরাকে নিয়ে সবাই একটা বড়ো পাটাতনে বসালেন। একে একে হলুদ মাখালেন, গীত গাইলেন। এরই মাঝে উপস্থিত সবাই হলুদ মাখামাখি করল। হাসাহাসি দৌড়াদৌড়ি করে একে অপরকে হলুদ আর রং মাখাতে লাগলেন। কেউ কেউ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও পারলেন না। এখানে শক্তিশালীরা তাদের প্রভাব খাটিয়ে জয়ী হলেন। সায়মার খুব ভালো লাগছে। শহরে তো প্রাণহীন অনুষ্ঠান হয় টাকার গরমে কিন্তু এখানকার অনুষ্ঠানগুলো প্রাণের আবেদনে রঙিন হয়ে উঠেছে। এর ভেতরে কোনো কৃত্রিমতা নেই। গোসল শেষ হলে দুই-তিনজন মহিলা নাদিরাকে কোলে করে ঘরে নিলেন। তারপর তাকে পায়েস খাওয়ালেন। গ্রামের মহিলারা যারা ক্ষীর পায়েস এনেছিলেন প্রত্যেকে

তা সবার মাঝে বিলালেন। মহিলারা পান খেয়ে নিজ নিজ বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। কারণ তারা আবার আসবেন বিয়েবাড়িতে। সায়মা নিজে গোসল সেরে সুন্দর একসেট জামা পরল। এমনিতেই সে সুন্দর এখন আরও সুন্দর লাগছে। নাদিরাকে সবাই মিলে সাজাতে বসল। বরের বাড়ি থেকে নাদিরার জন্য একটা লাগেজ পাঠিয়েছে। তার ভেতরে শাড়ি গহনা সবই আছে। সেখান থেকে সরঞ্জাম বের করে তা দিয়ে সাজানো হচ্ছে। টুকটুকে লাল বেনারসি শাড়িতে অপূর্ব লাগছে! সবশেষে গহনা পরানো হলো। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে নাদিরার দিকে তাকিয়ে রইল। বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও অপেক্ষাকৃত ভালো কাপড়চোপড় পরিধান করল। বরযাত্রীরা রওয়ানা হয়েছে জানা গেল। আসতে আরও দেড়-দুই ঘণ্টা লাগবে। বাড়িতে যারাই আসছেন নাদিরাকে দেখার জন্য তার ঘরেই আগে ঢুকছে। বাইরে রান্না হচ্ছে। খাবারের সুগন্ধে বাড়িটিতে আলাদা আমেজ তৈরি করেছে। নাদিরার মা এসে নাদিরাকে খাবার খাওয়াতে আসলেন। বর এসে গেলে তাড়াহুড়ো করে খাওয়ানোর সময় থাকবে না। মেয়েটা আজ নতুন একটা সংসারে প্রবেশ করবে, নতুন মানুষদের সাথে সংসার করবে। তাদের মন জুগিয়ে চলতে হবে। নাদিরার মায়ের চোখে পানি। এটা দেখে নাদিরাও কাঁদছে। উপস্থিত অনেকের চোখেই পানি। সায়মা ভাবে, মেয়েদের জীবনটা বড়োই অদ্ভুত। এক সংসারে বড়ো হওয়া, অন্য সংসারে নিজেকে উৎসর্গ করা। নিজের পরিবার, বাবা-মা, ভাইবোনদের সাথে বড়ো হয়ে ওঠা আর এক সময়ে অন্য একটা সংসারে জীবনযাপন করতে যাওয়া! সেই পরিচয়ে কেটে যাবে বাকি জীবন। তাদের চলাফেরা, আচার-আচরণ যদি অস্বাভাবিক হয় তাহলে কী হবে? কী করে কাটবে দিন? সব সংসার কি সমান মনোভাবের হয়? বাইরে শোরগোল— বর এসেছে! বর এসেছে!! নাদিরাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলো বরকে দেখার জন্য বেরিয়ে গেছে। এখন ঘরে শুধু নাদিরা আর সায়মা। সায়মা নাদিরার সাজগোজটা এই ফাঁকে আবার ঠিক করে দিলো। নাদিরাকে কাঁদতে নিষেধ করল সায়মা সাজ নষ্ট হচ্ছে বলে। ওদিকে বর দেখার জন্য ছোটো-বড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। যারা একবার দেখেছেন তারা সরে এসে কেউ কেউ প্রশংসা

করছে আবার কেউ কেউ খুঁত খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ ভিন্ন চেহারা নিয়ে জন্মায়। কেউ কারো মতো নয়, স্বভাবও এক নয়। যাদের ভেতরে ঈর্ষা আছে তারা খুশি হয় না অন্যের ভালো দেখে। পরশ্রীকাতরতা তাদেরকে ঘিরে থাকে অমোঘ নিয়মে। বরযাত্রীদের নাশতা শেষ করা হয়েছে। তারা বিয়ে সম্পন্ন করার তাগিদ দিয়েছে। দেনমোহর নিয়ে কথা হচ্ছে। দুপক্ষের সমান মতামতে সিদ্ধান্ড় নেওয়া হলো। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এসেছেন। দুপক্ষের কয়েকজন আসলো নাদিরার মতামত নেওয়ার জন্য। ওকে কাবিননামা পড়ে শোনানো হলো। এই মুহূর্তে ঘরটাতে বেশ ভিড় জমে উঠল। চোখের পানিতে নাদিরা স্বীকারোক্তি দিলো। আলহামদুলিল্লাহ বলে তারা গেলেন এবার বর সোহেলের কাছে। তার স্বীকারোক্তি হলে দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে বিবাহপর্ব সমাপ্ত হলো।

চলছে খাওয়াদাওয়ার পর্ব। বরযাত্রীদের প্রচুর খাওয়ানো হলো। সেইসাথে আমন্ত্রিত অতিথিরাও খাচ্ছেন। একদল উঠছে তো আর একদল বসছে। বিরামহীনভাবে চলছে খাওয়াদাওয়া। ইতোমধ্যে বরকে বাড়ির ভেতরে আনা হলো মেয়ের পাশে। মেয়েলি অনুষ্ঠানাদি শেষ হলো। বরকে বাড়ির সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়ের বাবা। নাদিরাকে ওর বাবা-মা জামাইয়ের হাতে, তার বাবার হাতে সঁপে দিলেন। এবার মেয়ের যাওয়ার পালা। কাঁদছে বাবা-মা, কাঁদছে আত্মীয়স্বজন, কাঁদছে নাদিরা। তবুও যেতে তো হবেই। অশ্রুসিক্ত চোখে মেয়েকে মুরব্বিরা গাড়িতে তুলে দিলেন। বরযাত্রী রওয়ানা হলো। এদিকে অবশিষ্ট লোকজনের খাওয়া চলছে। সায়মার মনটা খারাপ হয়ে গেল। একসাথে থেকেছিল দুটো দিন। ঘুরেছে, গল্প করেছে। কেমন যেন একা একা লাগছে। বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল সে। সামান্য হেঁটে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। এখনো অনেক মানুষ যাওয়া-আসা করছে। ভিড়ের ভেতরে একটা ছেলেকে দেখল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চেহারাটা কোথায় যেন দেখেছে। নদী থেকে ফেরার সময়ে যাদেরকে দেখেছিল তাদেরই একজন হবে হয়তো। আস্ড়ে আস্ড়ে বাড়িতে ভিড় কমতে থাকল। যারা কাছের আত্মীয়স্বজন তারা যার যার বাড়িতে ফিরে গেল। দূরের আত্মীয়রা একদিন পরে যাবে হয়তো।

জমিলা খাতুনের ভাই ও ভাবি সায়মার মাকে অনুরোধ করেছে ওদের ফিরিয়ানি আসার পরে যেতে। জানি না জমিলা খাতুন থাকবেন কি না। তার কোথাও বেড়ানোও হয়নি। বিয়ের ঝামেলায় সবাই ব্যস্ড় ছিলেন। তার আরেক বোন এক কিলোমিটার দূরে থাকেন। তারাও যাওয়ার জন্য বলেছে। সবাই আজ ক্লান্ড় আর অবসন্ন। প্রচুর খাটুনি গেছে সবার। মোটামুটি সবাই ঝামেলা শেষ করে বিছানায় আশ্রয় নিল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হলো প্রতিদিনের মতো। সবাই উঠে পড়েছে। সায়মা জেগেছে কিন্তু বিছানা ছাড়েনি। শরীরটাও ভালো লাগছে না। মনে মনে ভাবছে নদীর তীরে গেলে ভালো লাগত হয়তো। কিন্তু কার সাথে যাবে? জমিলা খাতুন এসে সায়মাকে বললেন, তার বোনের বাড়ি যাবে বেড়াতে। বেশি দূরে নয়। একদিন থাকবে সেখানে। সায়মা বলছিল নদীর তীরে যাবে বেড়াতে। ওর মা বললেন, সে বাড়িও নদীর বেশ কাছে। রাজি হয়ে গেল সায়মা। সকালে প্রাত্যহিক কাজ সেরে জমিলা খাতুন ভ্যানগাড়ি আনতে বললেন। মেয়েকে নিয়ে তিনি বোনের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কাঁচা রাস্ড়া কিন্তু মসৃণ। মা-বেটি দুজন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছে। রাস্ড়ার দুপাশে অনেক ঘরবাড়ি। সায়মা ভাবছে, বাংলাদেশের গ্রাম মানেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। গ্রাম মানেই অপার নয়নাভিরাম ও বৈচিত্র্যময়। ঋতুবদলের সাথে সাথে পালটে যায় প্রকৃতি। জীবনযাত্রাও পালটে যায় ঋতুবদলের সাথে সাথে। সব ঋতুই আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। তাদের নিজস্ব গুণে উদ্ভাসিত হয়, রাঙিয়ে দেয় জীবন। জমিলা খাতুন বললেন, বিশ বছর আগে এমনটা ছিল না। এখন মানুষ অনেকটা সচেতন হয়েছে। ভালো বাড়ি করছে অনেকে। মাটির রাস্ড়া হলেও খুব সুন্দর! ভাঙাচোরা, উঁচুনিচু নেই। রাস্ড়ার পাশে সবুজ গাছ আর খেতে সবুজ সবজি। তাছাড়া গ্রামের মানুষের সারল্য ও শান্ড়ির জীবন। তাদের তেমন উচ্চ চাহিদা নেই। তিনবেলা খাবার আর সাধারণ পোশাক হলেই চলে। সায়মা বলল আসলেই তাই। আমার খুব ভালো লেগেছে। এতদিন কেন আসিনি সেই আফসোস হচ্ছে। এখন থেকে কলেজে ছুটিছাটা হলেই চলে আসব এখানে। যদিও পথের বিড়ম্বনা কম নেই কিন্তু তবুও

ভালোলাগাকে কেন্দ্র করে আসা যায়। কথা বলতে বলতে তারা গন্ড়ব্যে পৌঁছে গেল। বাড়ির বড়ো ছোটো সবাই ছুটে আসলো ভ্যানের কাছে। সায়মা দেখল, এখানেও অন্যরকম আন্তরিকতা। খালার দুই ছেলে দুই মেয়ে। সবাই কলেজ, স্কুলে পড়ছে। মেয়েরা স্কুলের সীমানা পার করেনি। সায়মা ঘুরে ঘুরে বাড়িঘর দেখছে। বাড়ির চারপাশে আম, কাঁঠাল আর নারকেল গাছ। ঘরের পেছন দিকে ঠান্ডা বাতাস। খালাতো বোনটি ইশারা করে দেখাল ওখানে নদী। বিকেলে আমরা যাব সবাই। খালার ডাকে ওদেরকে ফিরতে হলো ঘরে। অনেক পিঠাপুলির আয়োজন। সবাই মজা করে খেতে লাগল। কিছু অতি-উৎসাহী প্রতিবেশী এসে ওদেরকে দেখছে। এবং বাড়ির কাজে হাত লাগাচ্ছে। সায়মা গ্রামের মানুষের আন্ড়রিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। শহরে একই বিল্ডিঙের ওপর-নিচের কারো সাথে যোগাযোগ থাকে না কিন্তু এখানে সবাই সবার খবর রাখে। সুখেদুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায়।